দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় আগন্তুক আরবি-ফারসি শব্দের বিভিন্ন উৎস

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার একটি অন্যতম ভাষা হল বাংলা। আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে মাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে এই ভাষার জন্ম। জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ১০০০ বছরের ইতিহাসে এই ভাষা বিভিন্নভাবে বিবর্তিত হয়েছে, যার স্পষ্ট স্পষ্ট ছাপ রয়েছে তার শব্দভাণ্ডারে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা এবং তার শব্দাবলী বিবর্তনের মধ্যদিয়ে একটি নির্দিষ্ট মান্যরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। আবার বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ তথা ভাষার প্রভাবে বাংলা শব্দভাণ্ডার বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষকরে আরবি, ফারসি, পর্তুগিজ, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভাষার শব্দ আত্মীকরণের মধ্যদিয়ে বাংলা শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। একটা সময় বাংলাভাষী মানুষের কাছে আরবি-ফারসি শব্দ গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল এবং বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিশিষ্ট উপাদান হিসেবে জায়গা করে নিয়েছিল। আজও তার প্রমাণ মেলে বাংলা মৌখিক গদ্যে এবং সাহিত্যের ভাষায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় আগত এই আরবি-ফারসি শব্দের উৎস কোথায় নিহিত রয়েছে তা আমাদের সন্ধান করতে হবে।

বাংলা ভাষায় আগন্তুক আরবি-ফারসি শব্দের উৎস মূলত দুটি— মৌখিক উৎস এবং সাহিত্যিক উৎস। বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণ পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ফারসি ভাষার প্রচলন হয়। শাসকদের সরকারি ভাষা ছিল ফারসি এবং ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পরিভাষার অধিকাংশই ছিল ফারসি। পরবর্তীকালে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু পরিভাষাগুলি থেকে গেছে। বাংলাভাষী জনগণও সেগুলি আত্মস্থ করে নিয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা ধর্মচর্চা করতে আরবি ভাষা শিখেছে। ধর্মের মূল সূত্রগুলি আরবি ভাষায় লোকমুখে প্রচলিত হতে থাকে। মাতৃভাষা বাংলা হলেও ধর্মীয় পরিভাষা কিন্তু আরবি। নিত্যদিনের ব্যবহৃত ভাষায় সেই আরবি পরিভাষাগুলি স্থান পেয়েছে শুধু নয় ক্রমে বিস্তার লাভ করেছে। ইসলাম ধর্ম-সংস্কৃতির বাহন এই আরবি ভাষার বহুশব্দ কেবল মুসলিম জনগণের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ রইল না, বাংলাভাষী সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ভাষায় কম-বেশি ব্যবহৃত হতে থাকল। যার প্রভাব পড়েছে বাংলা সাহিত্যের ভাষায়ও।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে যে মুসলিম শাসনব্যবস্থা চলেছিল তার প্রভাব বাংলা ভাষা

ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। বিশেষকরে মৌখিক ভাষার কথা এখানে গুরুত্ব দিতে হবে। কেবল শিক্ষিত জনগণ নয়, নিরক্ষর জনগণের ভাষাতেও রয়েছে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার। আমাদের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের নামবাচক শব্দগুলির একটা বড় অংশ হল আরবি-ফারসি শব্দজাত। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা বহু আরবি-ফারসি শব্দের তদ্ভবীকৃত রূপ কথ্যভাষায় ব্যবহার করি। যার মধ্যে রয়েছে খাদ্যদ্রব্য, আচার-শিষ্টাচার, আইন-আদালত, জমিজমা সংক্রান্ত, ধর্মবিষয়ক প্রভৃতি শব্দ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে পরিবেশ বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে আজও বিরাজমান তার কারণেই মুসলিম ধর্ম-সংস্কৃতির বহু আরবি-ফারসি শব্দ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের মৌখিক বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। দৈনন্দিন ব্যবহারের বাংলা গদ্যভাষায় যে সকল আরবি-ফারসি শব্দ বাংলার নিজস্ব শব্দে পরিণত হয়েছে তার একটা তালিকা[৩৩] O.D.B.L. গ্রন্থ অনুসরণে সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

প্রাকৃতিক বিষয়, বিষয়-বস্তু, দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত শব্দ :

অন্দর, আওয়াজ, আবহাওয়া, আশমান, ইয়ার, ওজন, কদম, কারখানা, খবর, খোরাক, গরম, চাঁদা, চাকর, জানোয়ার, জাহাজ, জিদ, তাজা, দখল, দরকার, দানা, দোকান, নগদ, নরম, নেশা, পছন্দ, ফুরসত, বন্দোবস্ত, বেকুব, মজবুত, মিয়া, মোরগ, মুলুক, রকম, সাদা, সাফ, হজম, হাজার, হুজুগ ইত্যাদি।

প্রশাসন, যুদ্ধ ও শিকার সংক্রান্ত শব্দ ঃ

আমির, উজির, খানদানি, খেতাব, তক্তা, তাজ, দরবার, দৌলত, নবাব, বাদশা, মালিক, হুজুর; কাতার, কাবু, জখম, তাঁবু, তোপ, কামান, দুশমন, ফৌজ, রসদ, শিকার, সর্দার, হিম্মত ইত্যাদি।

ভূমিব্যবস্থা ও আইন সংক্রান্ত শব্দ :

আবাদ, উশুল, খাজনা, খারিজ, চাকর, গোমস্তা, জমি, দারোগা, দপ্তর, নাজির, পেয়াদা, মহকুমা, মোহর, শহর, সরকার, সাল; আইন, আদালত, উকিল, এজাহার, এলাকা, কাজিয়া, কানুন, জারি, জেরা, দরখাস্ত, দলিল, নাকাল, নালিশ, পেশা, ফরিয়াদি, বাজেয়াপ্ত, মকদ্দমা, রদ, রুজু, শনাক্ত, সেরেস্তা, হক, হাকিম, হেফাজত ইত্যাদি।

খাদ্যদ্রব্য ঃ

আঙুর, কুলপি, কিশমিশ, কোর্মা, খরমুজ, গোস্ত, পোলাও, বাদাম, বিরিয়ানি, মিছরি ইত্যাদি।

শৌখিন দ্রব্য ঃ

আয়না, আতর, কলপ, কুমকুম, সুরমা, রুমাল ইত্যাদি।

ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত ঃ

অজু, আল্লা, ইদ, ইমান, ইমাম, ইসলাম, কাফের, কাবা, কোরবানি, গাজি, জেহাদ, জুম্মা, দরবেশ, দোয়া, নবি, নামাজ, নিকা, ফেরেস্তা, বিসমিল্লা, মসজিদ, মহরম, মুরিদ, মোমিন, মোল্লা, শরিয়ত, শিয়া, হাদিস, হালাল ইত্যাদি।

শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক ঃ

আদব, ইজ্জত, এলেম, কায়দা, গজল, তরজমা, দরদ, মজলিশ, মুনশি, বয়েত, বই, শরম, হরফ ইত্যাদি।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঃ

আচকান, আতশবাজি, আবলুস, কাগজ, কুলুপ, কিংখাব, খাতা, গজ, চাবুক, জামা, তক্তা, দস্তানা, দোয়াত, পরদা, ফানুস, বরফ, বারকোশ, মখমল, মশলা, রেকাব, রেশম, শাল, শিশি, সিন্দুক, হুঁকা ইত্যাদি।

বিদেশি নাম-শব্দ ঃ

আরব, আরমানি, ইংরেজ, ইউনানি, ইহুদি, উজবেক, বিলাতি, সাহেব, হিন্দু ইত্যাদি।

সুতরাং বাঙালি জনগণের মৌখিক ভাষা আরবি-ফারসি শব্দের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই মাধ্যমটি (মৌখিক ভাষা) দীর্ঘদিন ধরে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারকে ধরে রেখেছে। লিখিত উৎসে অনেকসময় বিতর্কিতভাবে এই শব্দ বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হলেও শব্দগুলি এমনভাবে বাংলা মৌখিক ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষায়

12763

ব্যবহৃত হয়ে আসছে যে, শব্দগুলি একান্তভাবে বাংলার নিজস্ব শব্দ হয়ে উঠেছে।

আরবি-ফারসি শব্দের আরেকটি প্রধান উৎস হল ইসলাম ধর্মগ্রন্থ। এই ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ 'কোরান' আরবি ভাষায় লিখিত এবং ইসলাম ধর্মের তাত্ত্বিক পরিভাষাগুলিও আরবিতে রচিত। "মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবি বলিয়া, জাতীয় সংস্কৃতির মূল বাহক ও ধারক হিসাবে এই ভাষার সহিত সোজাসুজি পরিচয় স্থাপন করা মুসলমানেরা নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ ভাষাগত কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কেননা, তাঁহারা জানিতেন বিদ্যার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য 'ফরজ' বা অবশ্য কর্তব্য। বাঙালী মুসলমানের দেশীয় সাহিত্য রচনায় এই আরবী-চর্চার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় যে সমস্ত আরবী-শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা শুধু আদালতে ব্যবহৃত ফারসী ভাষার মধ্যস্থতায় ঘটে নাই, ইহা বাংলায় ব্যাপকভাবে আরবী-ভাষা চর্চারও ফল।"[৩৪] এই আরবি চর্চা মূলত ধর্মচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মচর্চা এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি জানতে গিয়ে মৌখিক ভাষায় আরবি শব্দ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা ভাষায় ধর্মীয় অনুশাসন দানকালে ইসালম ধর্মগুরুদের কথ্যভাষায় ধর্মসংক্রান্ত তাত্ত্বিক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। যেমন— নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, দোজখ, বেহেস্ত, কেয়ামত, পয়গম্বর, কলেমা ইত্যাদি। এইভাবে ইসলাম ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ক আরবি-ফারসি শব্দ শুধু মুসলিমদের মধ্যে নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

তুর্কি বিজয়ের বহু পূর্বে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযোগ ঘটেছিল। ক. আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে। খ. ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ফকির-দরবেশদের আগমনে। এই সংযোগ আরও দৃঢ় হয় বঙ্গদেশে তুর্কিদের আগমনে। "এদেশে ইসলাম বিস্তৃতির সহিতই 'ইসলামী পরিবেশ' গড়িয়া উঠিতে থাকে। তুর্কীরা বাংলায় শুধু রাজ্য-বিস্তার ও যুদ্ধ বিগ্রহ করেন নাই, তাঁহারা ইসলাম বিস্তৃতির সাহায্যে দেশে একটি 'ইসলামী পরিবেশ' সৃষ্টিরও সহায়ক হইয়া উঠেন। ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার প্রভৃতির প্রত্যাবর্তনের মধ্যদিয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে যে পরিবেশ সৃষ্টি হইতেছিল, তাহাকেই 'ইসলামী পরিবেশ' নামে অভিহিত করিতেছি। এই পরিবেশ শুধু মুলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এদেশের অমুসলমানেরাও এই আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল।"[৩৫] এনামুল হক কথিত এই ইসলামি পরিবেশ একসময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। বাংলার জনমানসে এর অভিঘাতে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং বাংলা ভাষাতে নতুন নতুন আরবি-ফারসি শব্দ গৃহীত হতে থাকে। এই সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক পরিবেশও আরবি-ফারসি শব্দের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। বাংলা ভাষার ইতিহাসে এই উৎসগত পরিবেশ নিঃসন্দেহে চর্চিত হওয়ার দাবি রাখে।

মধ্যযুগের অভিজাত-দরবারি সংস্কৃতি আরবি-ফারসি শব্দের অপর এক উৎস হিসেবে বিবেচিত। অভিজাত মুসলমান শাসকদের সামাজিক আদব-কায়দা, নিয়ম-কানুন, আচার-

ব্যবহার দরবারি সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। এই সংস্কৃতির বাহক ছিল যে বাংলা ভাষা তা সাধারণের ব্যবহৃত ভাষা থেকে অনেকটাই আলাদা। আরবি-ফারসি শব্দবহুল এই ভাষার সঙ্গে রাজকার্যে নিযুক্ত কর্মচারীগণ অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন। এঁরা বাড়িতে সাধারণ বাংলায় কথা বললেও সরকারি কাজকর্মের ক্ষেত্রে দরবারি ভাষা ব্যবহার করতেন। এর ফলে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষাতেও দু-একটি করে আরবি-ফারসি শব্দ প্রবেশ করতে থাকে। এই প্রক্রিয়াটি কিভাবে ঘটে তা সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি সরস মন্তব্যের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে— "মুসলমান আগমনের কিছুকাল পরে কোন হিন্দু.....গেল মুসলমান শাসন-কর্তার কাছে বিচারের আশায়। বললে, 'ধর্মাবতার, হুজুর! — দেশ —' বলেই থমকে দাঁড়ালো। ভাবলে হুজুর কি 'দেশ' শব্দটা জানেন? 'হুজুর তো হাট-বাজারে ঘোরাঘুরি করে দিশী শব্দ শেখবার ফুর্সৎ পান না'— ...তাই 'দেশ' বলে থমকে গিয়ে বললে 'মুল্লুক'— ওটা হুজুরের যবনিক শব্দ। অতএব শেষপর্যন্ত তার নিবেদন দাঁড়ালো, 'দেশ-মুল্লুক ছারখার হয়ে গেল'।"[৩৬] এইভাবে অভিজাত দরবারি ভাষার শব্দ অনুকরণের ফলে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের বিস্তার ঘটতে থাকে।

দরবারি সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ হিসেবে যে সমস্ত আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে — আদাব, মজলিশ, মহফিল, নবাব, বেগম, কালিয়া, কোপ্তা, কোরমা, পোলাও, বাগিচা, মখমল, সেলাম, দরবার, চাকর, মুনশি, মেহেরবানি, হুজুর ইত্যাদি। দরবারি সাহিত্যের মধ্যেও অভিজাত-দরবারি সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। যার সার্থক দৃষ্টান্ত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল কবি সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের কাব্যভাষায় অভিজাত সংস্কৃতি-বহুল ভাষার অনুকরণ ঘটেছে। এছাড়াও যুদ্ধ বিগ্রহ সংক্রান্ত আরবি-ফারসি শব্দ দরবার থেকে ক্রমে জনসাধারণের ভাষায় ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক শিষ্টাচার, শৌখিন দ্রব্যের ব্যবহার, খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংস্কৃতিচর্চা প্রভৃতির সমন্বয়ে যে দরবারি সংস্কৃতি মধ্যযুগের মুসলমান শাসকেরা তৈরি করেছিলেন তার প্রভাবে প্রচুর ফারসি এবং অনেকসময় তার অন্তর্গত হয়ে আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। এই দরবারি সংস্কৃতি বাংলা ভাষায় আগন্তুক আরবি-ফারসি শব্দের উৎস হিসেবে পরিগণিত।

বাংলা ভাষায় আগন্তুক আরবি-ফারসি শব্দের লিখিত উৎস নিহিত রয়েছে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে। বিশেষ বিশেষ সাহিত্যশাখাকে এই শব্দের উৎস হিসাবে গ্রহণ করে দেখানো যেতে পারে যে, সাহিত্যক্ষেত্রে শব্দগুলির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকে সাহিত্যের ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ গৃহীত হতে থাকে। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদে'র ১২নং পদে একটি বিদেশি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে— "মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা"। এই 'ঠাকুর' শব্দটি হল তুর্কি

শব্দ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য থেকে মূলত আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' "মাত্র গোটা পাঁচেক ফার্সী শব্দ আছে [আরও কয়েকটি বেশি থাকতে পারে]।"[৩৭] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-এর মতে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আরবী-পারসীজাত মাত্র এই শব্দগুলি আছে— কামান (ধনু), খরমুজা, বাকী, মজুর, মজুরিআ, গুলাল, লেম্বু (নেবু), অফার।"[৩৮] সুকুমার সেন বলেছেন "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনেকগুলি আরবী-ফারসী শব্দ আছে। সেগুলি সংখ্যায় বেশি নয়।"[৩৯] এ প্রসঙ্গে আলোচনার টীকা অংশে তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ এই শব্দগুলি উল্লেখ করেছেন— 'কুত', 'খরমুজা', 'খেতি' (আরবী খ'তা), 'বাকী', আদবাহ (নামধাতু আরবী আদাব হইতে), 'মজুরী' ও 'মজুরীআ' (ফারসী মজ্‌দুর), 'মিনতি' (আরবী মিন্নৎ), 'গুণ' ("খণ্ডী সব দোষ গুণে", ফারসী গুনাহ্ হইতে), 'বেলাবলী' (রাগিণী), 'গুল্লাল' (পুষ্প বিশেষ) ইত্যাদি।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার যে বাংলা সাহিত্যের ভাষায় বৃদ্ধি পেয়েছে, তার একটি পরিসংখ্যান[৪০] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দিয়েছেন : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র (চতুর্দশ শতকের শেষভাগ) ৯৫০০ ছত্রে ৪টি ফারসি শব্দ রয়েছে। বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে'র (পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ) ১৮০০০ ছত্রে আরবি-ফারসি শব্দ রয়েছে ১২৫টি, মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গলে'র (ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ) ১৭০০০ ছত্রে রয়েছে ২২৫ টিরও বেশি, মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' (ষোড়শ শতকের শেষভাগ) প্রায় ২০০০০ ছত্রে রয়েছে ২০০-২১০ টি শব্দ, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' (অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ) ১৩০০০ ছত্রে রয়েছে ৪০০-এর বেশি আরবি-ফারসি শব্দ।

১৫৭৬ খ্রিঃ মোগলদের বঙ্গবিজয়ের পর থেকে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। কিন্তু এর আগেও ক্ষেত্র-বিশেষে এই শব্দের ব্যবহার ছিল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে মুসলমানদের কথা, ধর্মীয় বিষয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং মুসলিম সংস্কৃতি বিষয়ক বর্ণনায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রবণতা বেশি। যার সঙ্গে পরবর্তীকালের পুথিসাহিত্য বা দোভাষী সাহিত্যের ভাষার অনেকটাই সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসামঙ্গলে'র (১৪৯৫-৯৬) 'চতুর্থপালায়' মুসলমান শাসক 'হাসানের পুরীর বর্ণনা' অংশটি উল্লেখযোগ্য—

"কাজি মজলিস করি কেতাব কোরান ধরি
খাতাগুলো তজবিজ করে।
সোয়ার পেয়াদা মজুদাত শত শত
সদা পাঁচ হাথিয়ার ধরে।।

কেহ বা জুলুম করে কেহ গুনা শিরে ধরে
রুজু করি করয়ে নছাব।
যতেক ছৈয়দ মোল্লা জপয়ে ত বিসমল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব।।
হিন্দুত কলিমা দিল মুছলমানি শিখাইল
তথা বৈসে যত মুছলমান।
শিখয়ে নমাজ অজু সদাই মক্তবে রুজু
নিরন্তর খলিফা যোগান।।
নিকা বিভা ঘনে ঘন তথা করে সর্বজন
সদাই খোসালিত অতিশয়।
মোকাদিমে লৈয়া যায় কলিমা কোরান তায়
ফএতা পড়িয়া সাঙ্গ হয়।।
কোথা মোল্লা ডাকি লয় পীরের হাজত দেয়
সিরনি ফএতা কুতূহলে।
মোকামে তছলিম করি সভে যায় ঘরাঘরি
নানা সুখে বঞ্চয়ে সকলে।।"[৪১]

উল্লিখিত এই অংশে ১০০টি শব্দের মধ্যে ৪২টি আরবি-ফারসি শব্দ রয়েছে।

মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে (১৫৮৯) 'মুসলমানগণের আগমন' প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও যথেষ্ট পরিমাণে আরবি ফারসি শব্দ রয়েছে—

"আইল চড়িয়া তাজি সৈয়দ মৌলানা কাজি
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটি বোলয়ে হাসন হাটী
বৈসে কলিঙ্গ দেশ ছাড়ি।।
ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছোলেমানী মালাকরে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ।।
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরান।
কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শীরিনি বাঁটে
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান।।

বড়ই দানিসবন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রান গেলে রোজা নাহি ছাড়ে।"[৪২]

এখানে ৭০টি শব্দের মধ্যে ২১টি আরবি-ফারসি শব্দ

সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যের মুসলমান পির বড় খাঁ গাজির সংলাপে, রামেশ্বর ভট্টচার্যের 'সত্যপীরের পাঁচালী'তে পিরের সংলাপে আরবি-ফারসি শব্দ-সমন্বিত কাব্যভাষার ব্যবহার রয়েছে। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে'র বেশকিছু অংশে উক্ত কাব্যভাষার অনুবর্তন ঘটেছে। অষ্টাদশ শতকের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গলে' অজস্র আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যার মধ্যে অনেক পরিচিত ও অপরিচিত শব্দ রয়েছে। যেমন— আখের, আসান, আসোয়ার, ইজাফা, ইজার, ইর্‌শাল, একিদা, চাকর, জরদ, জায়গীর, দলুজ, নকিব, নফর, কুলুপ, খয়রাত, খিলকা, বন্দোবস্ত, বাজুকদ, বেদম, বেবাক, তরকোচ, তালাল, মজুদ, মোকাম, লাগাম, বকসীস, বকেয়া, সওয়ার, সরবন্দ, হাজার, হেকাত, হুকুম ইত্যাদি। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে বাংলা শব্দের সঙ্গে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দযোগে 'যাবনী মিশাল' রীতি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"মানসিংহ যোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে
কহে জাহাঁপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারি কিরামত।।
হুকুম শাহন শাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হৈল নিমকহারাম।
গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম।।
পাতশা হইলা খুশি কহিতে লাগিল তুষি
কহ রায় কি চাহ ইনাম।
কহে মানসিংহ রায় গোলাম ইনাম চায়
ইনাম সে যাহে রহে নাম।।"[৪৩]

কাজি আব্দুল মান্নান তাঁর 'Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal" গ্রন্থে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে দেখা গেছে ১৬০০ খ্রিঃ - এর আগে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের যে পরিমান তা ১৬০০-১৭০০ খ্রিঃ মধ্যে অনেক বেশি। আবার ১৭০০ খ্রিঃ পরে বৃদ্ধির প্রবণতা অনেকটা কমেছে।[৪৪]

মধ্যযুগের কাব্যভাষায় আরবি-ফারসি-শব্দ বৃদ্ধির যে প্রবণতা তা সমকালীন যুগের

পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক বলে আমাদের মনে হয়। কবিরা ইচ্ছাকৃত এই শব্দ ব্যবহার করেন নি, বরং স্বেচ্ছায় ব্যবহার করেছেন। আরবি-ফারসি শব্দবহুল এই কাব্যভাষাকে অনেকে বলেছেন 'মুসলমানি বাংলা'। আমাদের মনে হয় এই অভিধা যথার্থ নয় বা এই রকম নামকরণ নিয়ে তর্ক-বিতর্কও ঠিক নয়। কারণ "সব পুথির ভাষাই যে ইসলামি বা মুসলমানি বাংলা, তাও নয়। সাধারণভাবে ইসলামি সংস্কৃতি-নির্ভর আখ্যানে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ অনপেক্ষিত ও স্বাভাবিক।"[৪৫] সুতরাং বাংলা ভাষায় আগন্তুক এই শব্দগুলির সাহিত্যিক উৎস হিসেবে মধ্যযুগের সাহিত্য এবং অন্যান্য সাহিত্য শাখাকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

পুথি সাহিত্য ঃ

আরবি-ফরাসি শব্দবহুল বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের অন্যতম হল পুথিসাহিত্য বা দোভাষী পুথি। বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি বিশেষ কালপর্বে এই সাহিত্যের সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতকে এই ধারার সাহিত্যের সূচনা এবং উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত।[৪৬] এই সাহিত্যের ভাষা মধ্যযুগের প্রচলিত কাব্যভাষা থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এতে বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। ব্যাকরণের দিক থেকে না হলেও শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে এই ভাষা আলাদা। শব্দ ও পদপ্রকরণে আরবি-ফারসির প্রভাব রয়েছে। এই কাব্যভাষাকে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। সুকুমার সেনের মতে এটি 'এছলামি বাঙ্গালা' বা 'ইসলামি বাংলা'[৪৭]। রেভারেন্ট লং এই ভাষার নাম দিয়েছেন 'Musalmani Bangla'।[৪৮] William Goldsack বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের যে অভিধান তৈরি করেছিলেন তার নাম দেন "A Mussalmani Bengali-English Dictionary"।[৪৯] কাজি আব্দুল মান্নান এই ভাষারীতির সাহিত্যকে বলেছেন 'Dobhasi Literature',[৫০] আনিসুজ্জামানের মতানুসারে 'মিশ্রভাষা রীতি'র কাব্য।[৫১] নাম বিতর্কের জটিলতা থেকে সরে এসে আমরা বলতে পারি পুথি সাহিত্যের ভাষা হল বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি শব্দের সংমিশ্রণে গঠিত একটি সাহিত্যিক ভাষা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা।[৫২]

বাংলাদেশের এক যুগসন্ধিক্ষণে পুথি সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। নবাবি শাসনের পতন এবং কোম্পানির শাসনের সূচনাকাল হল এর পটভূমি।[৫৩] ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশির যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে ক্লাইভ কৌশলে বাংলার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। কিন্তু শাসনতন্ত্র আগের মতোই চলছিল, ফারসি 'রাজভাষা' থেকে গেল। বাংলা সাহিত্যের গতি ইংরেজ প্রভাব বর্জিত থাকল। রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য ফারসি ও উর্দু প্রভাবিত হতে লাগল। এই সময় দোভাষী বাংলায় অধিকাংশ মুসলমান কবি কাব্য রচনা

করতে থাকেন, যার নাম পুথি সাহিত্য।[৫৪] আনিসুজ্জামান এই কাব্যধারা সৃষ্টির পিছনে অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন— "সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে ফারসী সংস্কৃতির প্রভাব দেখা দিয়েছিল, নগরে ও বন্দরেই তার প্রকাশ হয়েছিল তীব্রতর। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র ঢাকা, রাজধানী মুর্শিদাবাদ ও হুগলী বন্দর তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।... বিদেশী লোকেদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগের ফলে এসব জায়গার ভাষায় বিদেশী শব্দ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হতে শুরু করেছিল।"[৫৫]

মুসলমানি বাংলা মুসলিম সমাজের কোনো অঞ্চলের মুখের ভাষা নয়, একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। আসলে "The mixed Bangali-Hindōstānī-Awadhī jargon which is heard in the bazaars of Calcutta among Mohammedan working classes, cabmen, petty traders and others, who speak Calcutta Bengali and Hindōstānī equally badly, and unlike the Mohammedan masses in the country, have no proper dialect."[৫৬] সুকুমার সেন মনে করেন "ইংরেজ আমলের শুরু হইতে কলিকাতার মজদুর মুসলমানদের ব্যবহার্য গ্রন্থে যখন আরবী-ফারসীর সঙ্গে বাঙ্গালার ও হিন্দীর মিশ্রণ খুব ঘন হইয়াছিল তখনকার সেই গ্রন্থ-ভাষাই যথার্থ 'এছলামি বাঙ্গালা'।"[৫৭] দোভাষী বাংলা বা মুসলমানি বাংলা ইংরেজ আমলে সৃষ্টি বলে এনামুল হক মনে করেন। তাঁর মতে "ইহা নিম্ন-বঙ্গ এবং তৎসন্নিহিত 'ওহাবী আন্দোলনের' প্রভাবে প্রভাবিত অঞ্চলের স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মুসলমানের মৌখিক ভাষা।"[৫৮] আমাদের মনে হয় এই যুক্তিটি যথার্থ নয়। কারণ মুসলমান জনগণের মৌখিক ভাষায় সর্বত্র এই ভাষার ব্যবহার হয় না। ইসলাম ধর্ম বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেখানে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না, সেক্ষেত্রে বাংলা শব্দের পাশাপাশি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

পুথি সাহিত্যের বিষয় মূলত ইসলামি ঐতিহ্য থেকে গৃহীত হয়েছিল। ইসলাম ধর্ম-প্রচারকদের চরিত্র, হজরত মহম্মদ পরবর্তী খলিফাদের বিজয় অভিযান, কাফের দলন কাহিনি, কারবালার কাহিনি, প্রণয় কাহিনি প্রভৃতি ছিল এই সাহিত্যের বিষয়বস্তু। এগুলির অধিকাংশ ফারসি ঐতিহ্য থেকে নেওয়া; উর্দু, হিন্দির মাধ্যমে বাংলায় এসেছে। ফলে কবিরা "যে ফারসী-হিন্দুস্থানী-হিন্দী আকর হইতে বস্তু গ্রহণ করিতেন সেই আকর হইতে শব্দ ও বাক্যাংশ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে লইতে দ্বিধা করিতেন না।"[৫৯] তাই দোভাষী পুথির ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রবণতা অনেকটাই বেশি। এই ভাষারীতির[৬০] বিশিষ্টতা হল—

১. আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের প্রয়োগ বেশি। যেমন—

"তিন কেতাবের আলেম নহে সে জাহেল
সাতশো সাগরেদ তার তমাম ফাজেল।"

অনেক প্রচলিত শব্দের পরিবর্তে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন—আকবত, আজিম, আন্দেশা, এক্বিদা, খাহেশ, ছুরত, জশন, নেকি, বেহেজার, মছলত, লায়েক, সহদ, হকিকত ইত্যাদি।

২. আরবি-ফারসি শব্দের নামধাতু রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন — খোসালিত (খোসহাল), গোজারিয়া (গুজর), নেওয়াজিয়া (নওয়াজ) ইত্যাদি।

৩. আরবি-ফারসি অনুসর্গের ব্যবহার। যেমন— বরাবর, খাতির, হাজির, বেগর, হুজুরে ইত্যাদি।

৪. ফারসি বহুবচন 'আন' বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন— বদিয়ান, বন্ধুয়ান, বেরাদরান, এজিদান, শহীদান, চাকরান ইত্যাদি।

৫. শব্দ ও পদ প্রকরণে আরবি-ফারসির প্রভাব।

৬. আরবি-ফারসি শব্দের মূল রূপকে গ্রহণ করার প্রবণতা বেশি।

বিষয়বস্তু অনুসারে পুথি সাহিত্যের শ্রেণিবিভাগ[৬১] নিম্নরূপ ঃ

১. **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান :** ইউসুফ-জোলেখা, সায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, সয়ফুল মুলুক - বদিউজ্জমাল ইত্যাদি। এগুলি আরব-ইরান-ভারতের পৌরাণিক, কাল্পনিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত নরনারীর প্রেমকাহিনি।

২. **জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য ঃ** আমীর হামজা, সোনাভান, জৈগুনের পুথি, হাতেম তাই ইত্যাদি। আরব-ইরানের বীরপুরুষদের যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যজয় ও ইসলাম প্রচারের কাহিনি, কারবালার কাহিনি এই কাব্যগুলির বিষয়বস্তু।

৩. **নবি-আউলিয়াদের জীবনীকাব্য ঃ** কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকেরাতুল আউলিয়া, হাজার মসলা ইত্যাদি। নবি, পির, আউলিয়াদের জীবন, চরিত্র - মাহাত্ম্য ও ধর্ম প্রচার এতে স্থান পেয়েছে।

৪. **লৌকিক পির-পাঁচালি ঃ** সত্যপীর, কালুগাজী-চম্পাবতী, বনবিবির জহুরানামা, লালমোনের কেচ্ছা ইত্যাদি। এগুলি হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে মুসলমান কাল্পনিক পির-ফকিরদের বিরোধ, যুদ্ধ এবং পরিণামে মিলন ও প্রতিষ্ঠালাভের কাহিনি।

৫. **ইসলামি শাস্ত্রবিষয়ক কাব্য ঃ** নসিহতনামা, ফজিলতে দরুদ, কেয়ামতনামা, সিরাতুল মুমেনিন, তরিকতে হককানি ইত্যাদি। ইসলামি আচরণবিধি, নীতিমালা ও উপদেশ এগুলিতে বর্ণিত হয়েছে।

পুথি সাহিত্যের আদি কবি ফকির গরীবুল্লাহ। দোভাষী বাংলা বা মিশ্রভাষা রীতিতে

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

তিনি রচনা করেন 'সোনাভান', 'সত্যপীরের পুথি', 'জঙ্গনামা', 'আমীর হামজা'। এগুলিতে তিনি বাংলা শব্দের পাশাপাশি প্রচলিত-অপ্রচলিত বহু আরবি-ফারসি শব্দ বিষয়বস্তুর নিরিখে ব্যবহার করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গরীবুল্লাহের 'আমীর হামজা' কাব্যে প্রায় ৩২% ফারসি শব্দ ব্যবহারের কথা বলেছেন।[৬২] কাজি আব্দুল মান্নান তাঁর 'Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal' গ্রন্থে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে দেখা গেছে গবীবুল্লাহের 'আমীর হামজা' গ্রন্থের কাহিনি শুরু থেকে ৬০টি শ্লোকে (couplets) ৭৯২টি শব্দের মধ্যে আরবি-ফারসি বা হিন্দুস্থানি শব্দ ৩৪৭টি।[৬৩] তাঁর কাব্য বিশ্লেষণ করলে উক্ত পরিসংখ্যানের প্রমাণ পাওয়া যায়—

১. "এয়সাই আল্লার দোস্ত আছিল আমির।
যার সাথে সাথে ফেরে খোওয়াজ খেজির।।
ভেদ বাত পেয়ে মর্দ আমির জাহান।
দেওকে মারিতে তীর খেঁচিল কামান।।"[৬৪]
—'আমীর হামজা'।

২. "যখন বসিল কুফর ছাতির উপরে।
সের জুদা কৈল যদি এমামের তরে।।
আরশ কোরস লহও কলম হইতে।
বেহেস্ত দোজক আদি লাগিল কাঁপিতে।।
আসমান জমিন যদি পাহাড় বাগান।
কাঁপিয়া অস্থির হৈল কারবালা ময়দান।।"[৬৫]
— 'জঙ্গনামা'

দোভাষী পুথি সাহিত্যের আর এক কবি হলেন সৈয়দ হামজা। তাঁর অন্যতম কাব্য হল 'আমীর হামজা' (গরীবুল্লার অসমাপ্ত পুথি তিনি সমাপ্ত করেন, ২য় খণ্ড), 'হাতেম তাই', 'জৈগুনের পুথি'। কাজি আব্দুল মান্নানের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সৈয়দ হামজার 'আমীর হামজা' পুথিতে কাহিনির শুরু থেকে ৬০টি শ্লোকে (couplets) ৬২২টি শব্দের মধ্যে আরবি-ফারসি বা হিন্দুস্থানি শব্দ ২৬৮টি।[৬৬] প্রাসঙ্গিক ভাবে তাঁর কাব্যের কিছু উদ্ধৃতি নিম্নরূপ ঃ

১. "কারুণের বহিন এক ছিল তার ঘরে।
খোওয়াবে দেখিল এব্রাহিম পয়গম্বরে।।

খোওয়াবে কহেন তারে এব্রাহিম নবী।
একিদাতে আল্লাকে ঈমান আন বিবি।।
আমির কয়েদ আছে বন্ধখানা বিচে।
খালাস করিয়া আন আপনার কাছে।।"[৬৭]
—'আমীর হামজা'।

২. "আওরত হইয়া চড়ে ঘোড়ার উপর।
জাহানে বদজাত নাহি তার বরাবর।।
চরকা পিওনি সাতে আওরতের কাম।
কুস্তিগিরী বাহাদুরী আলমে বদনাম।।
পিওনি কাবাস রুই আওরতের পেশা।
পর্দ্দার ভিতরে থাকে এলাহি ভরসা।।"[৬৮]
—'জৈগুনের পুথি'।

৩. "কহ মুসাফির কাহে না লেও নজরানা।
মেহমান হইয়া কাহে নাহি খাও খানা।।
কহিল হাতেম তাই বিবির খাতের।
রূপের মেহমান মোরা নাহি মুসাফের।।
সুরত জামাল তুঝে দিয়াছে খোদায়।
এ খাতিরে আসি মোরা দেখিতে তোমায়।।"[৬৯]
—'হাতেম তাই'

পুথি সাহিত্য-ধারার অন্যান্য কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন এয়াকুব আলি, গরীবুল্লাহ বেপারী, মুহম্মদ খাতের, আবদুল মজিদ খাঁ, মালে মহম্মদ প্রমুখ। এঁদের কাব্য বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে আরবি-ফারসি শব্দবহুল মিশ্রভাষারীতির অনুবর্তন। ইসলামি ঐতিহ্যের বিষয় অবলম্বনে রচিত এই কাব্যগুলি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের উৎস রূপে আজও স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে চলেছে। ফলে এই কবিদের রচনাও সম্পূর্ণরূপেই বাংলা, কাব্যভাষায় শুধু বিষয়-প্রতিবেশে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার না করলে সেই জীবন ও আখ্যানের মূল আবহটি তৈরি হত না।

সুফি সাহিত্য এবং পির সাহিত্য ঃ

সুফি মতবাদের উদ্ভব আরব দেশে। মুসলিম সাধক হাসানের এক ছাত্র ওয়াসিল বিন্ আতা এবং তাঁর শিষ্যরা 'মুতাযিলা' অর্থাৎ দলত্যাগী বলে আখ্যায়িত হন। কারণ ইসলামের মূল

মন্ত্রের সঙ্গে এদের সামান্য মতপার্থক্য ঘটেছিল। আরবের এই মুতাযিলাদের সুফি মতবাদের পূর্বসূরী হিসেবে গণ্য করা হয়।[৭০] এদের কিছুটা যুক্তিবাদী মতবাদ আরব এবং পারস্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ক্রমে পারস্যে সুফিবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করে। ওয়াসিল বিন্ আতা ছাড়াও বহু মনীষী সুফিবাদ প্রবর্তনে সহায়তা করেছেন। আবু হাসিম, ইব্রাহিম আদহাম, ফাজিল আয়াজ, দাউদ তায়ী, হাসান বসোরী ছিলেন প্রাচীন সুফি।[৭১] আল্লার প্রতি প্রেম সুফিদের ধর্ম ও সাধনার লক্ষ্য হওয়ায় ইসলাম ধর্মে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়।

সুফিধর্ম হল প্রেমের ধর্ম, আল্লার প্রতি প্রেম। "মরণ-নদীর এপারে ওপারে পরিব্যাপ্ত জীবনের নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধিতেই সুফী সাধনার সিদ্ধি।"[৭২] সুফিসাধকেরা প্রেম ও পবিত্রতার মাধ্যমে পার্থিব বিষয় থেকে যখন বন্ধনমুক্ত হন তখন দিব্য অবস্থা প্রাপ্ত হন। একেই বলে 'ফানা ফিল্লাহ' স্তর। "ফানা হল ঈশ্বরে বিলীন হয়ে অনন্ত জীবন লাভের একটা ধাপ। সাধনার মধ্যদিয়ে অনন্ত জীবনে উত্তরণ। জাগতিক বাসনা-কামনা-সংস্কার-অহং-আসক্তি; যেগুলি মানবের নিজস্ব স্বরূপ তার ধ্বংসসাধন করে ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক স্থাপন করাকে ফানা বলে। অর্থাৎ আত্মার ধ্বংস নয়। আমিত্ব লোপ। এর উত্তরণকালে সাধকের জাগতিক সম্পর্ক ধ্বংস হয়ে যায়। মানবাত্মার ধ্বংস নয়, মানবোচিত গুণাবলীর যথা ভোগ তৃষ্ণা, সুখ দুঃখানুভূতির বিলোপ সাধন ফানা।"[৭৩] 'জিকির' অর্থাৎ ঘনঘন আল্লা-নাম স্মরণ সুফিদের আচরণীয় বৈশিষ্ট্য। সুফিধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

১. সুফিরা সকলপ্রকার সম্প্রদায়গত ধর্মের উর্ধ্বে। এঁরা বর্ণভেদ, জাতিভেদ মানেন না।

২. সুফিরা ছিলেন প্রেমপন্থার সাধক। ইমানকে (ঈশ্বর বিশ্বাস) তাঁরা সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করতেন।

৩. সুফি হতে গেলে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়। গুরুর নির্দেশে ধর্মীয় জীবনে সাধনা করতে হয়। নামজপ তাঁদের সাধনার অঙ্গ।

৪. সুফিরা আচার-সর্বস্ব ধর্মাচরণে বিশ্বাসী নয়। নামাজ, হজ অপেক্ষা অন্তরের পবিত্রতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে নামাজকে তাঁরা উপেক্ষা করতেন না।

৫. সুফিরা পরধর্মসহিষ্ণু এবং মানবসম্প্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

বাংলাদেশে সুফিধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে আরব বণিকদের বাণিজ্য সূত্রে। তুর্কি বিজয়ের আগে এই বণিকদের সঙ্গে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন সুফি, পির, আউলিয়া, দরবেশ। পরবর্তীকালে দিল্লির সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে ভারত ও আরব রাষ্ট্রের সুফি দরবেশরা স্থলপথে যাতায়াতের সুযোগে ক্রমে বাংলাদেশে সুফি আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়ে। ইসলামি শাসকেরা রাষ্ট্রপরিচালনায় এঁদের পরমর্শ নিতেন। শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু কবি সুফি ভাবনার বশবর্তী হয়ে সুফি সাহিত্য রচনা করেন। এই সাহিত্যের উপাদান

গৃহীত হয় আরবি-ফারসি উৎস থেকে। যেগুলি ছিল ইসলামি সংস্কৃতি কেন্দ্রিক। ফলে কাব্য রচনায় বাংলা শব্দের পাশাপাশি অজস্র আরবি-ফারসি শব্দ প্রাসঙ্গিকভাবে কবিরা ব্যবহার করেছেন। স্বাভাবিকভাবে এই সাহিত্যগুলি আরবি-ফারসি শব্দের উৎস হিসেবে বিবেচিত।

বাংলা ভাষায় সুফি ভাবধারার বশবর্তী হয়ে অনেকে কাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্যধারার সার্থক দৃষ্টান্ত[৭৪] হল শেখচান্দের 'তালিবনামা', হাজী মহম্মদের 'সুরতনামা', মীর মুহম্মদ সফীর 'নুরনামা', সৈয়দ মীর সুলতানের 'জ্ঞানচৌতিশা' প্রভৃতি। এছাড়াও মধ্যযুগের সুফি কবি ও তাঁদের কাব্যগুলি হল—

১. শাহ মুহম্মদ সগীর — 'ইউসুফ - জোলেখা'

২. দৌলত উজির বাহরাম খাঁ — 'লায়লী মজনু'

৩. সাবিরিদ খাঁ — 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসুলবিজয়'

৪. দোনাগাজী চৌধুরী — 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল'

৫. সৈয়দ আলাওল — 'পদ্মাবতী'

৬. দৌলতকাজী — 'লোর-চন্দ্রানী'

৭. কোরেশী মাগন ঠাকুর — 'চন্দ্রাবতী'

এই সাহিত্যগুলির বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে অজস্র আরবি-ফারসি শব্দ।

সুফি মতে বিশ্বাসী পিরদের কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছিল পির সাহিত্য। এই সাহিত্যে মুসলমান পিরদের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। এর মাধ্যমে আসলে আল্লার মাহাত্ম্য প্রচার করা হত। ধর্মীয় সংস্কার বশত এই শ্রেণির কাব্যে অধিকমাত্রায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পির-সাহিত্যের সার্থক দৃষ্টান্ত—'কালু-গাজি-চম্পাবতী', 'ফতেমার সুরতনামা', 'বনবিবির জহুরানামা', 'বড় খাঁ গাজী', 'মানিক পীরের কেচ্ছা', 'সত্যপীরের পুঁথি', 'সত্যপীরের পাঁচালী' ইত্যাদি। বাংলা সুফি সাহিত্য এবং পির সাহিত্য যে আরবি ফারসি শব্দের উৎস-গ্রন্থ তার প্রমাণ হিসেবে উক্ত গ্রন্থে ব্যবহৃত কিছু শব্দের তালিকা[৭৫] নিম্নে দেওয়া হলঃ

অজুদ, আওয়াল, অলি, অজু, আরশ, আলিম, আজান, আজব, আদম, আসমান, আমিন, আউলিয়া, আওরত, আখের, আহাদ, আহম্মদ, আজরাইল, আয়েশা, আরফ, আমলনামা, আতশ, আখেরাত, আম্বিয়া, ইমান, ইমাম, ইয়ার, ইয়াদ, ইনসান, ইসরাফিল, ইবলিস, ইনসাল্লা, উরস, এলাহি, এবাদত, এলেল্লা, একিন, এনসাল্লা, ইশ্‌ক, এক্তিয়ার, একিদা, এজমালি, ওয়াক্ত, ওহি, ওরফ, ওয়াজিব, কবুল, কলমা, কালাম, কলিজা, কাফের, কাফেলা, কাতেবিন,

কেয়ামত, কেচ্ছা, কাওয়াল, কোরশ, কুদরত, কেরামত, কোরবান, কামেল, খয়রাত, খামস, খালাস, খসম, খোওয়াজ, খোশাল, খলিফা, গায়েব, গোনাগার, গোনা, গোর, গোজারিল, ছালাম, ছুরত, জিবরিল, জোহর, জান্নাত, জাকাত, জিন্নাত, জিন্নাতন, জবুর, জমিন, জনাব, জিকির, জাহির, জরিমানা, জায়গির, জিন্দা, জাহান, জায়নামাজ, জিয়ারত, জেহাদ, জঙ্গ, জান্নাতুল, তামাম, তাজ্জব, তরিকা, তওবা, তসবি, তাহারিয়া, তৌহিদ, দরগা, দোয়া, দোজখ, দস্তগীর, নবী, নফ্‌স্‌, নুক্তা, নসিব, নিগাবান, নুর, নাস্তা, নাচার, পারা, পয়গম্বর, পিয়ার, পয়দা, পরওয়ার, ফিকির, ফজর, ফর্জ, ফেরেস্তা, ফরমাস, ফতোয়া, বেগর, বেহেস্ত, বন্দেগী, বাহানা, বেশোমার, মোনাজাত, মোমিন, মাজার, মকবুল, মুসিবত, মুরিদ, মরদ, মগরব, মুছল্লি, মওত, মিকাইল, মখলুক, মুস্তাহাব, মযহব, মজলুম, মুনশী, মকছেদ, মোতাবেক, মজলিস, মারিফত, মোকাম, রব্বানা, লায়-লাহা, শরিক, শিরনী, শোকর, শহীদ, শরিয়ত, হাদিস ইত্যাদি।

বাউলগানঃ

বাউল এক লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়। এরা নিয়মনিষ্ঠ-শরিয়ত ধর্মের বিরোধী। তাই এদের প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায় বলা হয়। এরা কোরান-পুরাণ অস্বীকার করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে কাছে টেনে নিয়েছে।[৭৬] "সহজিয়া মতের বৈষ্ণব বিবাগী এবং সুফি মতের মুসলমান ফকির সমাজের উপর তলার মানুষের কাছ থেকে উপেক্ষা, বঞ্চনা, শোষণ, লাঞ্ছনা পেয়ে সমস্বার্থে একত্র হয়ে বাউল সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে।"[৭৭] এই সম্প্রদায় জাতি-বর্ণ-সম্পদ মুক্ত মানব সমাজ ও জীবন কামনা করে। এরা "দেহবাদী-গুরুবাদী-অধ্যাত্মবাদী এক লোকায়ত ধর্ম পালন করে।"[৭৮] সেই সঙ্গে বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনে লোভ-মোহ-ঈর্ষা-পাপ থেকে মুক্তি কামনা করে। বাউলের সাধনার প্রধান লক্ষ্য হল 'নফ্‌স' বা অহং বা আমিত্বকে ধ্বংস করা। এদের বিশ্বাস আপ্তনাশ না হলে 'অটল প্রাপ্তি' হয় না। বাউলের এই 'অটল' বা ঈশ্বর হলেন 'মনের মানুষ', 'সোনার মানুষ' বা 'অচিন পাখি'। তিনি বাস করেন মানুষের অন্তর্লোকে। প্রেম-ভক্তির পথে দেহসাধনার মধ্যদিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়।

বাউলের সাধনার একটি অঙ্গ হল দেহসাধনা। এরা নর-নারীর দৈহিক মিলনকে ধর্মীয়ভাবে বৈধ করে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ও নৈতিক চেতনার বিরোধিতা করে। 'ডিভাইন লাভ' বা অধ্যাত্মপ্রেমের জন্যই দেহ-প্রেম। স্বয়ং গুরু এই প্রেমের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।[৭৯] তাই তারা দেহজ প্রেমকে গ্রহণ করে যৌনাচরণে স্বাধীনতা নিয়ে এসেছে। এই যৌনাচার ব্যাভিচারমুক্ত। নারী তাদের কাছে পণ্য নয়, সাধনসঙ্গিনী রূপে নারীকে গ্রহণ করে তারা নারীর সামাজিক মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

বাউল হল গুরুবাদী সম্প্রদায়। এদের লিখিত কোনো তত্ত্ব নেই। মৌখিক ধারার গুপ্ত

তত্ত্বজ্ঞান গুরুর কাছ থেকে পেতে হয় এবং গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে, রীতিমতো মন্ত্রপাঠ করে বাউল হতে হয়। তাদের গোপনমন্ত্র গুরু ছাড়া আর কেউ জানে না। বাউল সাধকেরা সাধন পদ্ধতি যে গানের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেন, সেই গান হল বাউলগান। এই গানের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে— আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি। গানের মধ্যদিয়ে তাঁরা পরমাত্মার অনুসন্ধান করেন, যার বাস দেহের মধ্যে। তাই মানবদেহকে জানলে তাঁকে জানা যায়। এঁদের মতানুসারে মানবদেহ চতুর্ভূতে— আব (জল), আতস (আগুন), খাক (মাটি) ও বাত (বায়ু) এবং রজঃ-বীজে মানবদেহ গঠিত। এই মানবদেহকে যোগ সাধনার মধ্যদিয়ে জানতে হয়। "দেহ-সাধনা দ্বারা আত্মতত্ত্বের সন্ধান পেলে সিদ্ধি আসে। আত্মনাশ দ্বারাই পরমাত্মার আস্বাদন লাভ করা যায়। এই আত্মনাশকে লালন-বাউল 'জ্যান্তেমরা' বলেছেন।"[৮০] বাউল গানের রহস্যপূর্ণ ভাষায় এই সাধনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

বাউল সাধনায় হিন্দুতান্ত্রিক, সুফি, নাথযোগী, বৌদ্ধতান্ত্রিক, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মের প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে ইসলামি শরিয়ত পন্থার এরা ঘোর বিরোধী। এই কারণে তাঁদেরকে শরিয়ত পন্থীদের রোষের মুখে পড়তে হয়। তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজের ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার লক্ষ্যে ইসলামি নিয়মনিষ্ঠাকে অমান্য করে সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ফলে তাঁদের গানের ভাষায় ইসলামি তাত্ত্বিক শব্দ, পরিভাষা, সুফিতত্ত্বের বিভিন্ন পরিভাষা প্রভৃতির সমন্বয় ঘটেছে। তাই বাউল গানের ভাষায় অজস্র আরবি-ফারসি ইসলামিক শব্দ এবং শাব্দিক উপাদান স্থান পেয়েছে। গানের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রসঙ্গক্রমে একটি গান এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

"আগে **শরীয়ত** জান বুদ্ধি শান্ত করে।
রোজা আর **নামাজ শরীয়তের** কাজ,
শরীয়ত আসন ঠিক বলছো কারে।।
নামাজ রোজা কলমা জাকাত
তাও করিলে কয় **শরীয়ত**,
শরা কবুল করো।।
ভাবে বোঝা যায় **কলমা শরীয়ত** নয়,
শরীয়ত আর পরমার্থ থাকতে পারে
বেইমান বেলীরে জনা, **শরীয়তের আয়েত** চেনে না,
মুখে তোড় ধরে।।
চিনতো যদি **আয়েৎ** অদেখা **নিয়াত**

চিনতো না কভু বরজখ ছেড়ে
শরীয়তের গোস্তো ভারি,
যে যা বোঝে সেই হবে আখেরে।।
লালন বলে, মর বুদ্ধিহীন অন্তর,
আমি মারি মূল লাগে বৃক্ষের পরে।।"[৮১]

বাউল সাধকদের মন্ত্রগুলি বাংলা ভাষায় রচিত হলেও বিশিষ্টার্থক পারিভাষিক শব্দ এবং শব্দাংশের সমন্বয়ে এই ভাষা দৈনন্দিনের কথ্যভাষা থেকে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে। বাউল গানে "সাধনতত্ত্বের ভাবকে প্রকাশ করতে এরা আরবি ফারসি কখনও উর্দু শব্দ ও ভাবধারাকে আত্মীকরণ করে বাংলার ভাবধারা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বাঙালির নিজস্বভাষা ও সংস্কৃতিকে আরও ব্যাপক, প্রসারিত ও প্রকাশক্ষম করে তুলেছে।"[৮২] বাউল গানের ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দ, উপসর্গ, অনুসর্গ যোগে এক 'যাবনী মিশাল' রীতি তৈরি হয়েছে। তাই বাউল গানকে আরবি-ফারসি শব্দের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কীভাবে এই শব্দ এবং শাব্দিক উপাদান এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা সূত্রাকারে দেখানো হচ্ছে ঃ

১. বাউল গানে ব্যবহৃত বিভিন্ন আরবি-ফারসি শব্দ ঃ

অজুদে, আতস, আউল, আদম, আজাজিল, আলামীন, আশিক, আরফিন, আলজবান, আশা (লাঠি), আজগবি, আরকাম, আনখা, আশমান, আহাদ, আহামদ, আয়েৎ, আজব, আলিফ, আখের, আরিফ, আল্লা, আবাদ, আমির, আশরফ, আক্কেল, আহকাম, আন্দাজ, আরকান, ইবলীস, ইনকার, ইমান, ইলেল্লা, ইল্লিন, এবাদৎ, এলাহি, এব্রাহিম, এনতাজারি, ওয়াসিল, কালাম, করিম, কারিগীরি, কদম, কাফের, কুদরতি, কেয়ামত, কেতাব, কোরবানি, কলমা, কয়েদ, কালাম, কাছারি, খাক, খাস্তন, খেয়াল, খালাস, খান্দান, খলিলউল্লা, খোদা, খবর, গিল্লাত, গুজা (খেয়া নৌকা), গলদ, গোনা (গুনাহ), ছুরা, ছুরাত, ছেজদা, ছিনা, ছোড়ন, ছুন্নত, জাকাত, জানাজা, জাহের, জিকির, জোবান, জহর, জান, জিগির, জাহাজ, জেয়ারত, তরীক, তরীকত, তামাম, তুফান, তাজেল্লা, দস্তগীর, দায়মাল, দরিয়া, দরগা, দেল, দেওয়ান, দুনিয়া, দরবেশ, দোজখ, দীদার, দারোয়ানী, নফল, নাদান, নূর, নবী, নেহাজ, নেহার, নামাজ, পয়দা, পয়গম্বর, পস্তাবি, পীর, ফরজ, ফরমান, ফাজিল, ফানা, ফকিরি, ফেরেব, ফেরেস্তা, ফুলসেরাত, ফতেমা, ফিকির, বন্দেগি, বরকত, বরজখ, বাতুন, বেরাদর, বেলায়ত, বোর্‌কা, বেহেস্ত, বাদশা, বাখানি, বান্দা, বরাবর, মওত, মওলা, মকবুল, মকরউল্লা, মশাহেদা, মসনবী, মুন্সী, মারফত, মেয়ারাজ, মোনাজাত, মোকাম, মসকরা, মুর্শিদ, মেহের, মাশুক, মওয়াহেদা,

মশগুল, মঞ্জিল, মোমিন, মুসলমান, মুহুরি, মজহব, মেহমানি, মুল্লুক, মিম, মক্কর, রসুল, মুরিদ, রছুলুল্লা, রব্বানা, রেকাত, রোজকেয়ামত, রোজহাসর, রেয়াকত, রোজা, লাকুম, লায়লাহা, লায়েক, শমন, শরিয়ত, শেরেক, শরিক, সরহাদ, সরপোষ, সালাম, সালেক, সিজ্জীন, সেফাত, সোব্হান, সেরেফ, সাকিন, সুলুক, সেজদা, হকীকত, হজ, হদ্দ, হাজী, হায়াৎ, হুজুর, হাদিস, হরফ, হাকিম, হামেশা, হুজুরে ইত্যাদি।

২. **বাউল গানে ব্যবহৃত সুফিতত্ত্বের পারিভাষিক শব্দ ঃ**
আনল হক, আলেক, আলেপ, আসক-মাসক, ছালেক, ছিনা, দাল, নবীএজবাত ((নফি ইসবাত), নাছুত, ফানা, বরকজ, বন্দেগী, মিম, লাহুত ইত্যাদি।

৩. **বাউল গানে ইসলামিতত্ত্ব ও পরিভাষা ঃ**

আওজবেল্লা, আয়াত, আত্মাহিয়াৎ, আব-হায়াত, আহাদে-আহমদ, ইবলীস, ইমাম, ইমান, ইলেল্লা, ওহাদানিয়েৎ, কালাম, কাফের, কোরান, কুলহোআল্লা, খলিফা, জাকাত, তজবি, দোজখ, দায়েমী নামাজ, ফরজ, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, বিসমিল্লা, মেয়ারাজ, মোনাজাত, মওলানা, মৌলবী, রোজা, রোজ-কেয়ামত, রোজহাসর, রুকু, লা-শরিকালা, লায়লাহা, লাকুম, সেজদা, হজ, হাদিস ইত্যাদি।

৪. **আরবি-ফারসি শব্দযোগে রূপক, চিত্রকল্প ও ভাবকল্প ঃ**

আজবমীন, আয়নামহল, আজবকল, আজবকারখানা, আলেফের জের, অনুরাগের বাদাম, আসমানি আইন, অজুদ-ভাণ্ড, আজব-সম্ভব-সম্ভোগ, আরসবারি, আক্কেল আউল দরিয়া, আখের গুরু, আরশিনগর, আজব কুদরতি, আওয়াল দরিয়া, অটল নুর, আবহায়াতের নদী, এরফানি-কেতাব, কলমা দাতা, কুদরতি খেয়াল, খাকের পিঞ্জিরা, চাঁদের বাজার, চাবিছোড়ান, চারইয়ার, গোনখাতা, জাত এলাহী, জিন্দাপীর, জগৎ পয়দা, দেলদরিয়া, দেলকোরান, দশদরজা, দেলকেতাব, দিনদুনিয়া, দেহজমি, দীনদরদী, দেলমক্কা, নুরের বাতি, নবীর কর, তসবিমালা, প্রেমের বাদাম, ফানার ফিকির, নামাজের বীজ, ভবের বাজার, মানুষমক্কা, মানবজমিন, ভণ্ড মিস্ত্রী, ভবের হাট বাজার, মুরশীদভজন আইন, মাশুকরূপ, মিমের জবর, মুসলিমচাঁদ, মহাপীর আয়েন, মক্কা-মদিনা, মানুষ-মক্কা, রাধানামের বাদাম, রঙ-মহল, রোজ-কেয়ামত, রাম-রহিম, সদরবারি, সাধ-বাজারে, সরারকাজী, সালেকিমজ্জবি।

৫. **বাউলগানে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি উপসর্গ, প্রত্যয়, অনুসর্গযোগে গঠিত শব্দ ঃ**

ক. উপসর্গ ঃ

না (নঞর্থক অর্থে) — নারাজ

লা (নঞর্থক অর্থে) — লা-শরিক, লা-শরিকালা, লা-মোকাম

বে (নঞর্থক অর্থে) — বেহাল, বেসোমার, বেকলমা, বেমুরিদ, বেতালিম, বেজাতি, বে-সুহৃদ, বেভরসা, বেহুসারে।

খ. প্রত্যয় ঃ

খোর (আসক্ত অর্থে) — গাঁজাখোর

দার/দারি (ধারক বা কর্তা অর্থে) — চৌকিদার, দুনিয়াদারি, তসিলদার, তালুকদার

গির/গিরি (ব্যবসায় বা বৈশিষ্ট্য অর্থে) — দস্তগির, বৈষ্টমগিরি, মুন্সিগিরি।

কর (যে করে অর্থে) — বাজিকর।

খানা (স্থান অর্থে) — বারামখানা, ভেস্তখানা, মালখানা, রঙমহলখানা।

গ. অনুসর্গ ঃ

বরাবর, বাদে, মাফিক, হুজুরে ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলা চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ ঃ

বাংলা ভাষায় আগন্তুক আরবি-ফারসি শব্দের লিখিত এবং প্রধান উৎস হল পুরোনো বাংলা চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ। এগুলি প্রাচীন বাংলা গদ্যের নিদর্শন। এই গদ্য 'কেজোগদ্য' বা ভাবের গদ্য হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। ষোড়শ শতকে আমরা প্রথম বাংলা গদ্যের লিখিত রূপ পেলাম, যা সাহিত্যিক গদ্যের অনুসারী নয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিঠিপত্রের গদ্যও এই ধারার অনুবর্তী। এই গদ্যভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আরবি-ফারসি শব্দ তৎকালীন লিখিত গদ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ থেকে বোঝা যায় প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত গদ্যভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের বিশিষ্ট স্থান ছিল। ইংরেজ রাজত্ব শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত এদেশে ফারসি ছিল 'রাজভাষা'। সরকারি ক্ষেত্রে, আইন-আদালতে এই ভাষায় কাজকর্ম হত। সাধারণ মানুষ এই ভাষা না জানলেও তাদের কথাবার্তায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু আরবি-ফারসি শব্দ স্থান পেয়েছিল। বাংলাদেশ যখন মোগল শাসনাধীনে এল তখন থেকে এই শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা আরো বেড়ে গেল। জমি-জরিপ, খাজনা প্রভৃতি বিষয় গুরুত্ব পাওয়ার ফলে দলিল দস্তাবেজের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তখন "সাধারণ মানুষেরা রাজস্ব সম্পর্কিত আরবি-ফারসি পরিভাষা এবং অন্য শব্দ বজায় রেখেই বাংলায় দলিল দস্তাবেজ লিখতে আরম্ভ করেন।"[৮৩] এই দলিল দস্তাবেজের যে গদ্য তা আরবি-ফারসি শব্দ বহুল। তাই দলিল দস্তাবেজের গদ্য আরবি-ফারসি শব্দের উৎস রূপে পরিগণিত।

দিল্লির সুলতানদের মনোনিত বাংলার শাসকেরা কমবেশি বাংলা ভাষা-শিক্ষা করলেও তাদের প্রশাসনিক কাগজপত্রে ব্যবহৃত হত ফারসি ভাষা। "বঙ্গদেশের যে অঞ্চলে মোগল

শাসন প্রচলিত ছিল, সেখানে সরকারী চিঠিপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র ফারসিতে লেখা হতো বলে মনে করা সঙ্গত। কিন্তু সাধারণ লোকেরা অথবা ছোটো বড়ো জমিদারেরা ফারসিতে নয়, বাংলাতেই এসব কাজ করতেন।"[৮৪] ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আসাম-কাছাড়, কোচবিহার, ত্রিপুরা, মল্লভূমির মতো রাজ্যের শাসকদের সরকারি কাজের ভাষা ছিল বাংলা।[৮৫] এখানকার রাজা বা জমিদারেরা মোগল কর্মচারীদের সঙ্গে পত্রালাপে ফারসি ভাষা ব্যবহার করতেন। বাংলার রাজা বা জমিদারেরা যখন নিজেদের মধ্যে বাংলা ভাষায় পত্রালাপ করছেন তখন প্রসঙ্গক্রমে আরবি-ফারসি শব্দ তাঁদের লেখ্য গদ্যে স্থান পাচ্ছে। আবার সাধারণ মানুষও মুসলমান শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনার্থে চিঠিপত্রে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতো। এগুলি বাঙালি জনমানসে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে প্রাত্যহিক জীবন, চিঠিপত্র, প্রশাসনিক কাজকর্ম, জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আজও অনেক আরবি-ফারসি শব্দ আমাদের কাছে খাঁটি বাংলা শব্দের চেয়েও অধিক গ্রহণযোগ্য। যেমন— আমিন, আমল, ইজারা, কারবার, কায়েম, খাজনা, চাকর, জমি, দরখাস্ত, নজর, নালিশ, বকলম, বরাবর, বন্দোবস্ত, মালিক, মেয়াদ, সাজা, সেরেস্তা, হাজত ইত্যাদি।

বাংলা প্রাচীন গদ্যের নিদর্শনগুলিতে আরবি-ফারসি শব্দের প্রভাব দেখে মনে হয়, বাংলা গদ্যরূপেরর ক্ষেত্রে এই শব্দগুলি তখন জরুরি হয়ে পড়েছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে লিখিত পত্র বা অন্যান্য প্রমাণাদি ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হবে। ১৫৫৫ খ্রিঃ কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ যে পত্রটি অহমরাজ চুকাম্‌ফার নিকট পাঠিয়েছিলেন সেটিকে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়। রীতি অনুযায়ী দীর্ঘ সম্ভাষণ অংশ বাদ দিলে বাংলা গদ্যে লেখা মূল পত্রটি এইরূপ ঃ

"লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বদ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদোগতে আছি তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সতানন্দ কর্ম্মী — রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমাসদ্দার উদ্ভণ্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ী ২ ধনু ১ চেঙ্গা মৎস্য ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গইছে। আরু সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণ চামর ২০ শুক্ল চামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।"[৮৬]

এই পত্রে ব্যবহৃত 'সদ্দার', 'সমাচার' 'চিতাপ' (< ফা. শিতাপ), 'উকীল', 'বিদায়', 'বালিচ' শব্দগুলি আরবি ফারসিজাত। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের পত্রগুলিতে ক্রমে আরবি-

ফারসি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও পত্রগুলি বাংলা আদর্শ গদ্যের সার্থক নিদর্শন নয়, তবুও সেগুলিতে আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা গদ্যের যে বাহন হয়ে উঠেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রাসঙ্গিকভাবে সপ্তদশ শতকের একটি পত্রের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হল—

"স্বস্তি গুণিগণ গুণার্নব পরম পবিত্র যশোরাশি মণ্ডিত দিগদিগন্তরাধি পটলোৎপাটন শ্রী শ্রী যুত রাজা প্রচণ্ড প্রতাপেষু। দোয়া সেলাম লেখনং কার্য্যঞ্চ আগে তোমার কুশল হামেচা চাহো; ফের হামারে মিয়ার খবর হোএগা; আর তুমি এতবার নগুজস্তেও আমার রোখচো রোখহোএ। শ্রী শ্রী যুত খুর মল্লুক চরণেত দরগাতে মই সরচোর দেহঙ্গা। তোমারি মেজমতেত চাকরি দৌড় করে হি? অতএব কিলজিমিল্লা রায়তের খোচ হানি আর অধিককালে খানা জেভিহে পরং উমর কানাই কহিবেক হাজির আপনে কাজ গুজায় হাফিদকা হোএ ইতি জিলকাজ শক ১৫৪৯, মাহ ফাগুন, তেং ১২। চলচা ২০, লাহরি ২০, পামরি ৩, চিট ৫০, তাব ৪, পোয়াল ২০, লঙ্গ ২ মোনা, জাইফল ৩ মোন, স্বফেদ কাষ্ঠ ৪ চোর, লাল ৬ সের।"[৮৭]

পত্রটি লিখেছিলেন মোগল সেনাপতি সত্রাজিত; প্রাপক স্বর্গদেব সুসেঙ্ফা (প্রতাপ সিংহ)।

অষ্টাদশ শতকের চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বন্ধকনামা প্রভৃতির গদ্যে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা আরো বেশি। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ—

"গরিব পরওর সলামত

আমার ও আমার বড় ভ্রাতা হরিশ্চন্দ্র রাএর ঠাকুর সেবায় দেবোত্তর ও পেটঙ্গতা এ সকল লাখেরাজ জমিন চাকলে বোদা ও গয়রহ মতালকে জিম্বে থানে বেহার আছে তাহাতে সন ১১৯০ বাঙ্গলাতে আজরাহে জবরদস্তী সর্ব্বানন্দ অধিকারি থানে বেহারের মহারাণীর উসিলাতে আপনে ও অন্যদ্বারায় আমার দিগেক বেদখল করিয়া মোতসরফ হয় এজন্যে হুজুরে আরজী গুজরাইয়াদিলাওঁ তাহাতে সন ১৭৮৮ ইসবিতে আমারদিগের আরজীতে করমবকশি ফরমাইয়া মেস্তর মেরসর সাহেব ও মেস্তর যুবিট সাহেব নামে তজবিজে হুকুম হইয়াছিল হুজুরের হুকুমতে সাহেব মউযুফ মোকদ্দমা তজবিজ করিয়া হুজুরে রেপোট করিয়াছেন আমি তজবিজের ওক্তে সাহেব মউযুফ নিকট আপন হকের পহুছাইয়াছি তত্রাচ অদ্যাবধি আপন হকেক পহুছিতেছিনা জদ্যপী রেপোট দ্রষ্টী করাতে হুজুরে কোন বিষয় শোভা গুজরে তবে গোলামপর সওাল হইলে অখন আপন হক বুঝাইতে পারি খোদাওন্ধ সেলমত বাজে জমির পর এক্তিয়ার হকদারের আর ইলাকা সরকার দৌলৎমদার হইতে বাদ্ধ সওায় সরকারের হুকুম কাহার সাধ্য বাজেআপ্তের নাই হুজুরের আইন রেবাজ ও ধর্ম শাস্ত্রানুসারে জমিদার কীম্বা অন্য কেহ এ জমিনে দাখিল হইতে পারেনা গোলাম জোনমবলিদার

"ঠাকুর সেবা এবং খোরাপোসে আজেজ একারণ উমেদওার জে সাহেব মউযুফে এ মোকদ্দমার রেপট মুলাহেজা ফরমাইয়া ইনসাফ হুকুম হয় জে গোলাম আপন হকে পহুছে ইহা জোনাবে আরজ করিল ইতি — তে ১৬ আশাঢ়—

আরজী
ফিদবি
শ্রীশ্যামচন্দ্র রায়।"[৮৮]

এইরূপ অজস্র চিঠিপত্র, দলিল, বন্ধকনামা, বিক্রয়পত্র, হুকুমনামা, এজহারনামা, দানপত্র প্রভৃতির গদ্যভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের আধিপত্য দেখা যায়। এই শব্দগুলি সেদিনের প্রকাশমাধ্যমের ক্ষেত্রে আবশ্যক ছিল। বাংলা গদ্যের প্রথমযুগে এই শব্দগুলির গুরুত্বের কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজের দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে আমরা বরং প্রাচীন বাংলা গদ্যে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করতে পারি। এক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ সেনের "প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন" গ্রন্থ, Siva Ratan Mitra- এর "Types of Early Bengali prose" গ্রন্থ, সুধাংশুশেখর তুঙ্গের "বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা" প্রভৃতি গ্রন্থের পত্রে ব্যবহৃত শব্দ অনুসরণ করা হয়েছে ঃ

অবতর, অজাব, আজেজ, আদব, আদালত, আবওয়ার, আবকারি, আবাদ, আমদানী, আমল, আমিন, আরজ, আলিয়ান, আহদ, আহদনামা, আকায়দ, আচর্ফি (আসরফি), আফতাব, আফিয়ত, আয়াজেজাম, আরামত, ইজাফ, ইজারা, ইজাহার, ইনসাব, ইরসাল, ইলাকা, ইসবাত, ইস্তমরার, ইসাদী, ইস্তাহার, ইয়াদ, ইস্তাদ, উযুল, উসিলা, এক্তিয়ার, একবারগি, একবাল, একরার, এজাজত, এতফাক, এনায়ত, ওয়াদা, ওজর, ওক্ত, ওফা, ওয়াসিলাত, ওয়াকিফহাল, কবুল, করজা, করার, কসম, কানুন, কাম্বকত, কারবার, কারসাজি, কিম্বা, কুরুক, কারকুন, কৈফিয়ৎ, খত, খবর, খানা, খয়ের, খাজনা, খাদিম, খারিজ, খেজালত, খোদ, খোসালা, গরজ, গরদিস, গায়েব, গুজরান, গোমস্তা, গোলাম, গ্রফতার, চস্ত, চিতাপ, ছিলছেলা, জবানি, জমাইত, জবর, জরবাজি, জরিপ, জাহির, জিঞ্জির, জিম্বা, জোনাব, তকরার, তছরূপ, তজবিজ, তদারক, তরকিক, তরফ, তহসিল, তাহুত, তাহবালা, দখল, দরখাস্ত, দরবার, দরমাহা, দস্তখত, দস্তুর, দাখিল, দিলাসা, দৌলত, দাদ, নজর, নাচার, নাফরমানি, নালিশ, নিগাহ, নিয়াজ, নেগাদাস্তী, পরদাজি, পরেশান, পরোয়ানা, ফরমাবরদার, ফরিয়াদ, ফারাগতি, ফিসদ, বকলম, বন্দোবস্ত, বয়নামা, বরখেলাপ, বহাল, বাবুদ, বুনিয়াদ, বেদস্ত, মখলিফের, মজমুন, মতজ্জ, মদদগার, মনসব, মবলগ, মরহুম, মহলত, মাকুল, মালিক, মুচলকা, মেসারা, মোজাহিম, মোলাকাত, মউযুফ, রাফাহিয়ত, রেবাজ, রোয়দাদ, লাখেরাজ, লোকসান, শোভা, সফর, সরফরাজ, সরিয়ত, সলামত, সলাহ, সাফ, সাবেক, সেরেস্তা, সোয়াগাত, হকিকত হাবেলি, হিমাকত, হেফাজৎ, হেমায়তি, হোরমত ইত্যাদি।

বাংলায় আগন্তুক আরবি-ফারসি শব্দের উৎস হিসেবে মৌখিক ভাষা এবং লিখিত বিভিন্ন সাহিত্যকে আমরা বেছে নিয়েছি। সাহিত্যিক উৎসের মধ্যে পুথি সাহিত্য, সুফি সাহিত্য, পির সাহিত্য, বাউল গান এবং প্রাচীন বাংলা গদ্য তথা দলিল-দস্তাবেজ - এর ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই শব্দগুলিকে উক্ত সাহিত্যিক নিদর্শনের ভাষা থেকে বিশ্লিষ্ট করা যাবে না। এই উৎসগুলি ছাড়াও মুর্শিদিগান, জারিগান, রোমান্টিক প্রণয়কাব্য প্রভৃতি সাহিত্যিকেও এ বিষয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিষয়গত এবং তত্ত্বগত সাদৃশ্যের কারণে এই উৎসগুলিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করতে আমরা বিরত থেকেছি।